ইউনিট
২১

অপরাধ প্রবণতা

সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ও কিশোর অপরাধ

ভূমিকা

অপরাধ বলতে সাধারণত সমাজ ও আইন নিষিদ্ধ দণ্ডনীয় কাজকে বোঝায়। অপরাধ প্রবণতা মানুষের জন্মগত কোন বিষয় নয়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক কারণে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্র উভয় রাষ্ট্রেই সরকারকে কতিপয় অপরাধ মোকাবেলা করতে হয়। অপরাধ প্রবণতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। শান্তি প্রিয় মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, কিশোর অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : অপরাধ প্রবণতার কারণ।
পাঠ-২ : অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব।
পাঠ-৩ : সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায়।
পাঠ-৪ : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি।
পাঠ-৫ : বাংলাদেশে দুর্নীতি।
পাঠ-৬ : বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ।
পাঠ-৭ : কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়।

পাঠ-১ : অপরাধ প্রবণতার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অপরাধ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- আপরাধের কারণ সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- অপরাধ প্রবণতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

অপরাধের সংজ্ঞা

যে প্রচলতি রীতি ভঙ্গ করলে বা কর্ম সম্পাদন করলে শাস্তি পাবার সম্ভাবনা থাকে তাই অপরাধ ।

- সমাজ বিজ্ঞানী ই.এইচ. সাদমল্যাণ্ড বলেন, 'আইন লঙ্ঘন করাই অপরাধ ।'
- অপরাধ বিজ্ঞানী স্টিফেন বলেন, 'অপরাধ হচ্ছে সেসব কাজ করা, যার জন্য আইনে শাস্তির বিধান আছে ।'
- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, 'যে প্রচলিত রীতি-নীতি ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান করা হয়, তা ভঙ্গ করাই অপরাধ ।'
- সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসনের মতে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিধিবদ্ধ প্রথা বা জনমত লঙ্ঘন করাকে সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায়, অপরাধ হচ্ছে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ যা সম্পাদন করলে শাস্তি পেতে হয় ।

বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতার কারণ

অপরাধ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সেই সব সমাজ বিরোধী কাজকে বোঝায় যেগুলো সেই সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি । আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজই হচ্ছে অপরাধ । অপরাধের সাথে মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিদ্যমান । কোনো এক উৎস বা কারণ অপরাধের জন্য দায়ী নয় । বাংলাদেশে অপরাধের কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো –

(১) **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** স্থান, কাল, পাত্রভেদে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । কেননা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অভাবের তাড়নায় মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে । ধনী দেশগুলোতে অপরাধের কারণ ভিন্ন ।

(২) **সঙ্গ দোষ :** মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না । পরিবেশের প্রভাব, অপরাধীদের সাথে মেলামেশা করায় অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে ।

(৩) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে চায় । দারিদ্র্যের আঘাতে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে । কেননা সমাজে যারা স্বচ্ছল তাদের মত হবার বাসনায় আর্থিক মর্যাদা লাভের জন্য দারিদ্র শ্রেণীর কিছু লোক অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে । সমাজে বিত্তবানদের টাকা–পয়সার প্রাচুর্য, দামি দামি বিলাস সামগ্রীর রূপ দেশের যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে অপরাধপ্রবণ করে তোলে । দরিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা, শিল্পায়ন ও শহরায়ন ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয় । অনেক ক্ষেত্রেই, মানুষ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ।

(৪) **পাশ্চাত্যের প্রভাব :** পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতছানিতে একশ্রেণীর লোক বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। সামজিকভাবে ক্ষতিকর নগ্ন প্রকাশনা, আমোদ-প্রমোদ, ছায়াছবি প্রভৃতি মানুষকে অপরাধ প্রবণ করেছে।

(৫) **সামাজিক আস্থা :** বাংলাদেশে হতাশা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, নিরক্ষরতা, বস্তি জীবন, নোংরা সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে।

(৬) **প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি :** কেউই জন্মগতভাবে সন্ত্রাসী বা অপরাধী নয়। কিন্তু পরিবর্তিতে বিভিন্ন কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। যেমন– দৈহিক অস্বাভাবিক অবস্থা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অপরাধীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে পারে।

(৭) **সামাজিক অবক্ষয় :** বহুবিধ কারণে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনৈতিকতার বিস্তার ঘটেছে, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামজিক অবক্ষয়। সামাজিক অবক্ষয় অপরাধের জন্ম দিচ্ছে।

(৮) **রাজনৈতিক প্রশ্রয় :** রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাবার লোভে বহুলোক অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে। অবৈধ কাজ করলে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে অপরাধী আরও অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে ও অন্যকে উৎসাহিত করে।

(৯) **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** বাংলাদেশে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অপরাধীকে খুঁজে বের করে অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না। কেননা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অপরাধী কাজ চালিয়ে যায়, ক্রমেই অপরাধ বেড়ে চলে।

বাংলাদেশের কতিপয় অপরাধ

১। **ঘুষ :** অনিয়ম ও বেআইনি পন্থায় কাজ করে দেবার জন্য যে আর্থিক লেনদেন হয় তাকে ঘুষ বলে। অযথা হয়রানির জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফাইল আটকিয়ে আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য আর্থিক লেনদেনকে ঘুষ বলা হয়। বাংলাদেশে ঘুষ সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে অনেকে ঘুষ না বলে 'বাড়তি সুবিধা' বলতে চায়। ধর্মীয় বিধান মতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। ঘুষ জাতিকে অপরাধের দিকে ধাবিতে করে।

২। **দুর্নীতি :** দুর্নীতি বলতে নীতিবিহীন কাজ করাকে বোঝায়। প্রশাসন বিজ্ঞানে দুর্নীতির অর্থ হল দায়িত্বশীল পদে সমাসীন হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থায় নেমে আসে অন্ধকারের ঘনঘটা। দুর্নীতির কারণে প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে না, ন্যায়বিচার থেকে নিরপরাধ লোক বঞ্চিত হয়, অযথা কাজে বিলম্ব ঘটিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। দুর্নীতি ভয়াবহভাবে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।

৩। **কর্ম ফাঁকি :** প্রশাসনিক জগতে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য দৈনন্দিন কাজকর্ম বরাদ্দ থাকে। যদি কর্মচারী তার দৈনন্দিন কাজকর্ম না করে ফেলে রেখে দেয় তবে তাকে কর্ম ফাঁকি বলে। কর্ম ফাঁকি এক ধরনের সামাজিক অপরাধ। নিজের কাজ না করে অন্যের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাজে ফাঁকি ও অপরের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। কর্ম ফাঁকি দিতে যারা অভ্যস্ত তারা শুধু অন্যের কাজে বিঘ্ন ঘটায় না, বরং নিজের দলভারী করার জন্য অন্যকে আকর্ষণ করে। ফাঁকিবাজ কর্মচারীরা এত সংঘবদ্ধ যে, তাদের কিছু বলাও যায় না। তারা অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনিক উপায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্ম ফাঁকি থেকে দেশকে উদ্ধার সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

৪। **মাদকাসক্তি :** মানুষ মাদকদ্রব্য সেবন করলে অল্প দিনের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মাদক দ্রব্য সংগ্রহ ও ভোগের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে। মাদক দ্রব্য সেবনের পয়সা যোগাড় করার জন্য চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদক-ব্যবসায়ী ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার

বিধান করা আবশ্যক। এভাবে মাদকাসক্তি সমাজকে কুলষিত করে। দেশকে মাদক দ্রব্যের অন্যায় ব্যবহার থেকে মুক্ত করার তাগিদে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

৫। **আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি :** আইন না থাকলে ন্যায়বিচার থাকে না, ন্যায়বিচার না থাকলে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে অপরাধীচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে ও অপরাধের জাল বিস্তার করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিত করলে অপরাধী গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়বে। অপরাধীর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করলে জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে ও ভালোভাবে আশার আলো নিয়ে বেঁচে থাকবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য নাগরিক ও সরকারকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সারসংক্ষেপ

অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিকতাহীনতা। দেশের আপমর জনগণকে নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সৎ পরিশ্রমী ও সৎপথে রোজগারে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে পারলে সমাজ থেকে অপরাধ দূরে সরে দাঁড়াবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধ বলতে কি বুঝায়?

(ক) আইনগতভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড (খ) সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড

(গ) অনৈতিক কর্মকাণ্ড (ঘ) উপরের সবকটি

২। 'আইন লঙ্ঘন করাই অপরাধ' – উক্তিটি কার?

(ক) র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (খ) ই.এইচ. সাদারল্যাণ্ড

(গ) বি. অ্যাচলার (ঘ) কোনটি নয়

৩। অপরাধের মূল কারণ কি?

(ক) নৈতিকতাহীনতা (খ) পারিবারিক শিক্ষা

(গ) আইন-শৃঙ্খলার অবনতি (ঘ) ঘুষ

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অপরাধপ্রবণতা কাকে বলে?

২। নৈতিকতাহীনতার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার সম্পর্ক কী?

৩। ঘুষ, দুর্নীতি ও কর্ম ফাঁকি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অপরাধপ্রবণতার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ) ২। (খ) ৩। (ক)

পাঠ-২ : অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অপরাধ প্রবণতা রোধে সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিকের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নাগরিক দায়িত্ব

অপরাধ প্রবণতা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার আবশ্যক। সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও দায়বদ্ধতা আছে অপরাধ দমনের। কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নিম্নে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করা হলো :

(১) অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

(২) অপরাধ সংঘটন হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।

(৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৪) সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বকে নির্বাচন করতে হবে যাতে তারা অপরাধীকে প্রশ্রয় না দেয়।

(৫) সংঘবদ্ধভাবে অপরাধীর কাজে বাঁধা দিতে হবে।

(৬) অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

(৭) অপরাধীকে তার কর্মকাণ্ডের পারিণতি সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

(৮) বেসরকারি উদ্যোগে কিশোর অপরাধী, মাদকাসক্তদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) আদালতে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাক্ষ্যের অভাবে অনেক অপরাধী খালাশ হয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্র বা সরকারের দায়-দায়িত্ব

ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনজীবনের শান্তির শত্রু। এই শত্রুর মূলোৎপাটন করতে হলে নাগরিক ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন–

(১) **পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি :** পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করে অপরাধের বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে সাহসী কাজের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ কাজ ও ভীরুতার জন্য তিরস্কার করতে হবে। নাগরিকদের জানমাল, নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে পুলিশ বাহিনীকে সংখ্যায় ও অস্ত্রে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় জনগণকে অপরাধীদের হাত থেকে নিরাপদে রাখতে পারে।

(২) **বিচার ব্যবস্থা :** বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ বিচক্ষণ বিচারক নিয়োগ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে বিচারকদের মর্যাদা রক্ষার্থে উচ্চতর বেতন-ভাতা দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার কাজের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যাতে প্রকৃত অপরাধীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বের হতে না পারে। অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

(৩) **কারাগার সংগঠন :** অপরাধী অপরাধ করে ধরা পড়লে দ্রুত আদালতে সোপর্দ করে আদালত থেকে কারাগারে পাঠিয়ে দিতে হবে। কারাবাসে অপরাধীদেরকে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে তারা কারাভোগের মধ্য দিয়ে সংশোধিত হয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

(৪) **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :** অপরাধ ছোট হোক আর বড় হোক অপরাধ করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। শাস্তি যত কঠোর হবে অপরাধ তত কমে যাবে। গুরুতর অপরাধকারীর বিচার করে সরকার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা অপরাধ রোধ করতে পারে।

(৫) **সংশোধনমূলক :** অপরাধ বিজ্ঞানে অপরাধকে ব্যাধি হিসেবে গণ্য করা হয়। ওষুধ সেবন করলে যেমন ব্যাধি দূর হয় তেমনি অপরাধের চিকিৎসা করলে অপরাধ দূরীভূত হয়। সরকার অপরাধীদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের সমাজে পুনর্বাসন করতে পারে। তাছাড়া অপরাধকে অপরাধ মনে না করে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে অপরাধ হ্রাস পায়।

অপরাধ দমনে পুলিশের ভূমিকা : মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সমাজ থেকে অপরাধের উৎপত্তি ও বিকাশ। অপরাধকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হলে আইন সহায়তাকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য। পুলিশ কথাটির অর্থ সাহায্যকারী। সমাজে নিরীহ জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিত পুলিশের হাতে ন্যস্ত। পুলিশ তৎপর হলে অপরাধী চক্র সতর্কতা অবলম্বন করে সাবধান হয়। কিন্তু পুলিশ যদি অবহেলার সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে অপরাধ দমন তো দূরের কথা, তা আরও বিস্তার লাভ করে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সব লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে করার জন্য অভিযান চালাতে হবে। কিন্তু যদি তারা উদাসীন, ঘুষ, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। মূলত পুলিশের তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিচারক বিচার কার্য সম্পাদন করেন। পুলিশ যদি দুর্নীতি পরায়ন হয়, তবে তদন্ত কার্যে অপরাধী 'নিরাপরাধ' হিসেবে আবির্ভূত হবে। কাজেই সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থেও পুলিশকে সৎ ও দক্ষ হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

অপরাধ দমনে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও দায়িত্ব আছে। অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে না পারলে অপরাধ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। ঘুষ, দুর্নীতি, মাদকাশক্তি, কিশোর অপরাধ প্রভৃতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে অপরাধ প্রবণতা রোধে রাষ্ট্রকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অপরাধী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেলে অনেকেই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় অপরাধ বেড়েই চলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন ।

১ । অপরাধ দমনে নাগরিকের কোন দায়িত্ব নেই ।

২ । অনেকক্ষেত্রে সাক্ষীর অভাবে অপরাধী মুক্তি পাচ্ছে ।

৩ । অপরাধ প্রবণতা রোধের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের ।

৪ । মাদকাসক্তি অপরাধ নয় ।

৫ । সামাজিক সচেতনতা গড়ে অপরাধ প্রবণতা মোকাবেলা করা যায় ।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১ । অপরাধ দমনে নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করুন?

২ । পুলিশ বাহিনী কিভাবে অপরাধ দমন করতে পারে?

৩ । সচেতনতা সৃষ্টি করে কিভাবে অপরাধ প্রবণতা রোধ করা যায়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । অপরাধ দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন ।

২ । অপরাধ প্রবণতা রোধে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । মি, ২ । স, ৩ । স, ৪ । মি, ৫ । স

পাঠ-৩ : সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সন্ত্রাস বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে সন্ত্রাসের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- সন্ত্রাস দমনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস বলতে বল প্রয়োগমূলক কার্যকলাপকে বোঝায় । আইনকে উপেক্ষা করে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করাকে সন্ত্রাস বলে । সাধারণ জনগণের ওপর ভয়-ভীতি প্রদর্শনপূর্বক যে কোন ধরনের আক্রমণ বা হুমকিকে সন্ত্রাস বলে অবিহিত করা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের FBI এর মতে, বেসামরিক নাগরিকের ওপর স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের হামলাকে সন্ত্রাস বলে । সন্ত্রাস আইন বিরোধী জবরদস্তীমূলক কার্যকলাপ । সন্ত্রাসী কার্যকলাপে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে । নাগরিক জীবন বিপন্ন হয় । মানুষের কোন সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না । সহজ কথায়, সামাজিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে পেশী শক্তির জোরে অপরাধ করাকে সন্ত্রাস বলে ।

সন্ত্রাসের কারণসমূহ

সন্ত্রাস এর উৎস একটি নয়, একাধিক । নানা কারণে ও অবস্থাভেদে সন্ত্রাসের জন্ম হয় এবং বিস্তার লাভ করে । আমাদের দেশে সন্ত্রাসের কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

(১) **অবস্থানগত ও পারিপার্শ্বিক কারণ :** ভৌগোলিক অবস্থান হেতু বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সন্ত্রাস ঘটে । শীতপ্রধান দেশে তুলনামূলকভাবে সন্ত্রাস কম হয় । গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সন্ত্রাস বেশি । সন্ত্রাসের সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান । উন্নত দেশে সন্ত্রাস কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেশি । উন্নত দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ স্থিতিশীল । কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ অনিশ্চিত ও অস্থির । এজন্য সন্ত্রাস দানা বেঁধে ওঠে ।

(২) **ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গঠন :** অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও শক্তি, মানসিক অস্থিরতা ও ঈর্ষাবোধ হতে সন্ত্রাসের জন্ম হয় ।

(৩) **পারিবারিক প্রভাব :** সন্ত্রাসীর সন্তান সন্ত্রাসী হওয়ার ঘটনা বিরল নয় । তাছাড়া অসামাজিক কাজে অভ্যস্ত অপরাধীর ছেলে-মেয়েরা সন্ত্রাসী হয় বেশি ।

(৪) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক মর্যাদা, শহরায়ন ও শিল্পায়নের মধ্য থেকে সন্ত্রাসের জন্ম হয় । ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ও দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেকেই সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে । বেকারত্ব সন্ত্রাসের জন্ম দেয় । বেশি দিন বেকার থাকার ফলে মানসিক ভারসাম্যের অবনতি ঘটে এবং বেপরোয়া জীবনের চর্চা করতে করতে সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে । আর্থিক মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে সম্ভোগের জীবনযাপনের তাগিদে কেউ কেউ সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে । শহরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় । শহরের বাজারগুলো দামি সামগ্রীতে ভরে ওঠে । কিন্তু যারা তা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভোগ করতে পারে না, তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তা পেতে চায় । বাংলাদেশে আর্থিক অবস্থার জন্য সন্ত্রাসের প্রবণতা বেশি ।

(৫) **সামাজিক অবস্থা :** বিপর্যস্ত পরিবার, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষার অভাবে সন্ত্রাস দানা বেঁধে ওঠে । যে পরিবারে ছেলে-মেয়েদের প্রতি বাবা-মার স্নেহ, ভালোবাসা থাকে না, সে পরিবারের ছেলেমেয়েরা মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে গড়ে ওঠে । ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষের দেহ ও মনের ওপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে মানুষকে অসহনীয় করে তোলে। ফলে সন্ত্রাসের জন্ম হয়। সুশিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে সামাজিক অবস্থা সন্ত্রাসের জন্য দায়ী।

(৬) **রাজনৈতিক অবস্থা :** বাংলাদেশের সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান উৎস হল অনুন্নত রাজনীতি। এখানে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা সন্ত্রাস করে এবং সন্ত্রাসীকে সাহস ও সহযোগিতা দান করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সন্ত্রাসী কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ও কর্মী। অবৈধ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার লক্ষে সন্ত্রাসীদের পোষণ করে এবং প্রয়োজনবোধ তাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাসের কারণ হল কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রের রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি।

(৭) **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** দুর্বল প্রশাসন, মারদাঙ্গা ধরনের সিনেমা, যাত্রা ও নাটকের ছড়াছড়ি, নোংরা ছায়াছবি, মাদকদ্রব্য সেবন, অশ্লীল পত্রিকা ও পুস্তিকার প্রকাশনা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রশাসনিক কঠোরতার অভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায় তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকবৃন্দের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সেজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক।

(১) **সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন :** সন্ত্রাস দমনের লক্ষে সন্ত্রাসীদের বিচারের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যারা প্রকাশ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি সাধন করছে তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। সন্ত্রাস দমনের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাস আপনা থেকে কমে যাবে।

(২) **পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন :** সন্ত্রাসীরা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাস করে। সেখানে পুলিশকে লাঠি ও প্রাচীন রাইফেল, বন্দুক দিয়ে সন্ত্রাস দমন করানো যাবে না। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এখানে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা। এ অবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশর সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ও উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) **কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকার ভাতা প্রদান :** দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ওঠে করতে হবে। বেকারত্ব দূরীকরণ সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর দেশের মতো না হলেও ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার মতো বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকার ভাতা উত্তম ব্যবস্থা।

(৪) **সর্বজনীন শিক্ষা ও মূল্যবোধের জাগরণ :** সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।

(৫) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ :** দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি করা যাবে না। ছাত্র সমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষকের কল্যাণের জন্য কল্যাণ সমিতি গঠন করা যেতে পারে কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংশ্রব থাকা চলবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা করতে পারলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সিংহভাগ হ্রাস পাবে।

(৬) **রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়া :** কোনো রাজনৈতিক দলের ক্যাডার থাকা চলবে না। রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিলে সে দলের রেজিস্ট্রেশন বতিল করতে হবে।

(৭) **প্রশাসনিক কঠোরতা :** সন্ত্রাস দমন, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোনো কারণে কারও কাছে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন মাথা নত করবে না এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেবে না। এরূপ শক্ত হাতে প্রশাসন গড়ে তুলতে পারলে সন্ত্রাসী আপনা থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে।

(৮) **গণসচেতনতা :** জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সন্ত্রাস দমনের মহৌষধ। জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

সারসংক্ষেপ

বেসামরিক লোকের ওপর যে কোন ধরনের হামলাই সন্ত্রাস। হুমকি কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করাও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ব্যাধি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি কারণে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে। সন্ত্রাস দমনের প্রধান দায়িত্ব সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের হলেও নাগরিকদেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সন্ত্রাসব বলতে বুঝায় —

(ক) প্রতারণা (খ) ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান (গ) জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি সন্ত্রাসের উদাহরণ —

(ক) হুমকি প্রদান (খ) কর ফাঁকি (গ) ঘুষ গ্রহণ (ঘ) উপরের সবকটি

৩। সন্ত্রাস প্রতিরোধের মহৌষধ কি?

(ক) প্রশাসনিক কঠোরতা (খ) সার্বজনীন শিক্ষা (গ) গণসচেতনতা (ঘ) কঠোর আইন প্রণয়ন

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সন্ত্রাস বলতে কি বুঝায়?

২। সন্ত্রাসের পাঁচটি কারণ লিখুন?

৩। সন্ত্রাস প্রতিরোধের পাঁচটি উপায় লিখুন।

৪। গণসচেতনতা কিভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে পারে?

৫। সন্ত্রাস দমনে পুলিশের ভূমিকা কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিস্তারের কারণসমূহ লিখুন।

২। কিভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব – তা আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (ক) ৩। (গ)

পাঠ-৪ : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে মাদকাসক্তির কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মাদকাসক্তি বাংলাদেশের অন্যতম এক সামাজিক সমস্যা। মাদকের ভয়াবহ ছোবলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বহু তরুণের তাজা প্রাণ। বিঘ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া। কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বই ভয়াবহ এ সমস্যার সম্মুখীন।

মাদক দ্রব্য ও মাদকাসক্তি : মাদক দ্রব্য হচ্ছে সে সব নিষিদ্ধ বস্তু যা গ্রহণের ফলে স্নায়ুবিক বৈকল্যসহ নেশার সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট সময় পর পর তা সেবনের দুর্বিনীত আসক্তি অনুভূত হয়। কেবল সেবন দ্বারাই সে তিব্র আসক্তি (সাময়িক) দূরীভূত হয়। এর কু-প্রভাব ও ভয়াবহতা মারাত্মক।

বাংলাদেশে যেসব মাদক দ্রব্যের সেবন সর্বাধিক সেগুলো হলো– গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, মদ, বিয়ার, তাড়ি, পঁচুই, প্যাথেডিন, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। এসব মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে নেশা সৃষ্টি ও অপ্রকৃতিস্থ হওয়াকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)'র মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে, চিকিৎসায় গ্রহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রমাগত বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা এবং এসব দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তির কারণ বহুবিধ। এ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসকরা মাদকাসক্তির অন্তরালে যে কারণগুলো সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো :

১. **সঙ্গদোষ :** মাদকাসক্তির জন্য সঙ্গদোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হলে সে তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সুস্থ সঙ্গীটিও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।'

২. **কৌতূহল :** কৌতূহলও মাদকাসক্তির একটি মারাত্মক কারণ। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জেনেও অনেকে কৌতূহলবশত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। এভাবে একবার দু'বার গ্রহণের ফলে এক পর্যায়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৩. **সহজ আনন্দ লাভের বাসনা :** মানুষ অনেক সময় আনন্দ লাভের সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৪. **বিদ্রোহী মনোভাব :** কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে গড়ে ওঠে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তারা ভালো-মন্দ বিচার না করে সামাজিক অনেক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মিশে যেতে চায় অথবা ভাঙ্গতে চায়। এই বিদ্রোহী মনোভাব তাদেরকে অনেক সময় মাদকাসক্ত করে তোলে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা :** তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তৃতির একটা প্রধান কারণ হলো হতাশা। পরীক্ষায় ফেল, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, সেশন জট, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে তারা তাদের শোক, বিষাদ ও বঞ্চনার চেতনাকে নেশায় আচ্ছন্ন করতে চায়।

৬. **পারিবারিক কলহ :** প্রতিটি সন্তানই চায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে মা ও বাবার মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে সু-সম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শ দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকে, যা অনেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যায়ে এসব সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে অন্যভাবে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে।

৭. **পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাব :** এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অনেকের পিতা-মাতার মধ্যে নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাবে এসব পিতা-মাতার সন্তান সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৮. **ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতি :** ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চরিত্রবান করে তুলে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি মদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৯. **চিকিৎসাসৃষ্ট মাদকাসক্তি :** বহু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য প্রথম গ্রহণ করে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে ও ঘন ঘন ব্যবহারের কারণে সেই জীবন রক্ষাকারী ওষুধই একদিন তাকে মাদকাসক্ত করে তোলে।

১০. **মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা :** নেশা জাতীয় বস্তুটি যদি মানুষের হাতের কাছে না থাকে তবে মানুষ নেশা বা মাদকাসক্ত হবার সুযোগ পাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অনেকটা প্রকাশ্যেই মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে মাদকাসক্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের উপায়

মাদকাসক্তির জন্য বহুবিধ কারণ দায়ী। তাই এ সমস্যা মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্যা মোকাবেলায় একই সেঙ্গ প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো –

ক. প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিদের প্রথমে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা হয়, যাতে সে আর পুনরায় মাদক গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। পরে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে তার হারানো ক্ষমতা ফিরে পায় এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

খ. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তির করাল ছোবল থেকে সমাজ ও সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কার্যক্রম নেয়া হয় তাকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলে। মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধকরণের লক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম চালু করা।

৩. বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার, আলোচনা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন করা।

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্তি বাংলাদেশের সমাজে ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। হতাশা, বেকারত্ব, সঙ্গদোষ, কৌতুহল, পারিবারিক কলহ, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। মাদকের ভয়াল ছোবল হতে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে একই সঙ্গে প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। কৌতুহল মাদকাসক্তির একটি কারণ।

২। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

৩। পাঠ্যপুস্তকে মাদক বিষয়ে আলোচনা অনুচিত।

৪। সমগ্র বিশ্বই মাদক সমস্যা মোকাবেলা করছে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের মাদকাসক্তির কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২। মাদক সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। স, ২। মি, ৩। মি, ৪। স

পাঠ-৫ : বাংলাদেশে দুর্নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- দুর্নীতি বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- দুর্নীতি দমনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

দুর্নীতি বাংলাদেশের এক ভয়াবহ সমাজিক ব্যাধি । দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি জেঁকে বসেছে । বিশ্ব দরবারে দুর্নীতি ও বাংলাদেশ যেন সমর্থক শব্দ হয়ে গেছে । দুর্নীতির ভয়াবহ সর্বগ্রাসী অবস্থার কারণে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ।

দুর্নীতির সংজ্ঞায়ন

দুর্নীতি হলো 'নীতি' বহির্ভূত কাজ । যেসব কাজ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় বহন এবং সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে সমাজের সংহতি ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে তাকে দুর্নীতি বলে । দুর্নীতি রাষ্টীয় তথা জাতীয় জীবনের জন্য অভিশাপ । রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে রাষ্ট্র কাঠামোকে বিকল করে দেয় । আক্ষরিক অর্থে, দুর্নীতির বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় দুষ্টনীতি । অর্থাৎ দুষ্টজন যে নীতি অবলম্বন করে অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী যে ধরনের কাজ করে তা-ই দুর্নীতি । তাছাড়া পারিভাষিক অর্থের দিক বিবেচনায় দুর্নীতি হলো যখন ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবৈধ উপায়ে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী কাজ করে অথবা তাদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তেমনি কাজ করাতে রাজি বা বাধ্য করায় সেই পরিস্থিতিকে দুর্নীতি বলে । দুর্নীতি হলো এমন এক ধরনের বিচ্যুতিমূলক আচরণ, যা মানুষকে নিকৃষ্ট প্রাণীর কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ভাষ্য অনুযায়ী দুর্নীতি হলো– "Corruption is the abuse of public office for private gains."

Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, Corruption means anything doing in unusal way." অর্থাৎ, "অবৈধ পথে কিছু করাকেই দুর্নীতি বলে ।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশে দুর্নীতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়নি । দেশে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে । বিগত বছরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্বে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষস্থানে । ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষায় বাংলাদেশ পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান দখল করেছে । দুর্নীতির এমন ভয়াবহ অবস্থা দেশের অবকাঠামোকে নড়বড়ে করে দিয়েছে । বাংলাদেশের যে ক্ষেত্রে দুর্নীতি অধিক হারে ঘটে থাকে সেগুলো হচ্ছে–

১. রাজনৈতিক;
২. প্রশাসনিক;
৩. সেবা খাত: স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা, পুলিশি সেবা, বিচার বিভাগ, শিক্ষা;
৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র: উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শুল্ক, কর ও ভ্যাট, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন;
৫. বেসরকারি ও অন্যান্য ক্ষেত্র ।

বাংলাদেশের দুর্নীতির কারণ

বাংলাদেশের দুর্নীতি এমন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, এ নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। তাই সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ গবেষণা করে দুর্নীতিরে কারণ উৎঘাটনে তৎপর হয়েছেন। গবেষণার আলোকে দুর্নীতির যেসব কারণ উদঘাটিত হয়েছে তা হলো–

১. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জনাবদিহিতার অভাব

গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে প্রশাসনযন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ করা, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে প্রশাসনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়। এতে দেশের বৃহৎ স্বার্থ উপেক্ষিত থাকে। দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায় মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

২. সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন কাঠামো

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী ও জীবিকা নির্বাহের মান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারি এবং বেসরকারি বেতন কাঠামো গঠন করা হনি। সুতরাং যথার্থ বেতন কাঠামো করা প্রয়োজন।

৩. নৈতিক মূল্যবোধের অভাব

যে জাতির নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে, সে জাতি চরম হতাশা, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মাঝে নিমজ্জিত হবে। তাছাড়া নৈতিক মূল্যবোধের অভাব হলেই মানুষ অনৈতিক কার্যকলাপ করতে দ্বিধা করে না। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশে নৈতিকতার চর্চা কমে যাওয়ায় দেশের দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো টাকা, পেশি শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ এখানে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য। নির্বাচনের সময় টাকার ছড়াছড়ি হয় এবং নির্বাচনের পরে সরকারি কোষাগারের টাকা লুটপাট করে নির্বাচনী ব্যয় ওঠানো হয়। টাকাকে সাদা করারও ব্যবস্থা করা হয়। ফলত সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি লাগাম ছাড়া দৃষ্ট হয়।

৫. মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

অর্থ বছরে (২০০৭-০৮) সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ১১.৯২ শতাংশ এবং বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি দিন দিন বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৬. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

আইন-শৃঙ্খলা একটি দেশের রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে ৯০ শতাংশ দুর্নীতি হয়ে থাকে।

৭. দুর্নীতি দমনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাব

দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হলেও দুর্নীতি দমন কমিশন এখনও স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। দুর্নীতি দমন কমিশনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবেই মূলত দুর্নীতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্নীতি দমনের উপায়

বাংলাদেশে দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে গ্রথিত। একদিনে তা উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে দুর্নীতিকে বিভিন্নভাবে দমন করা যেতে পারে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা আলোচনা করা হলো–

(১) দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যবিধি বিস্তৃত করতে হবে।

(৩) সরকার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুক্ত রাখতে হবে;

(৪) দলমত নির্বিশেষে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে আইনের মখোমুখি দাঁড় করাতে হবে।

(৫) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন আধা সরকারি এবং এনজিও কর্মীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৬) দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(৭) আইনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তি প্রদান করে দুর্নীতি সম্পর্কে জনমনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে।

(৮) নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করতে হবে।

(৯) রাজনৈতিক অঙ্গণে দুর্নীতিবাজদের বয়কট করতে হবে। কোনো দলে যাতে দুর্নীতিবাজরা প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(১০) দুর্নীতি দমন কার্যক্রম যাতে কোনো বিশেষ মহলের চাপে বন্ধ বা ভিন্নপথে পরিচালিত না হয় সেদিকে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

(১১) ঘুষ দেয়া ও নেয়া সম-অপরাধী এবং উভয়ই দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে উভয়কে দুর্নীতিবাজ হিসেবে গণ্য করে শাস্তি প্রদান বা সামাজিকভাবে বয়কট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

(১৩) সরকারের সকল কাজে জনগণের সম্পৃক্ততার লক্ষে জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম চালু করতে হবে। এতে দুর্নীতি নির্মূল না হলেও আশানুরূপ হ্রাস পাবে।

সার-সংক্ষেপ

দুর্নীতি বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্নীতি একদিকে আমাদের নৈতিক শক্তিকে খর্ব করছে, অনদিকে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এতে বিদেশী বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। কেবল আইন করে দেশে দুর্নীতি দমন করা যাবে না। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন–

১। ঘুষ দেয়া ও নেয়া ---------- ।

২। দুর্নীতির বিরুদ্ধে---------- আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৩। দুর্নীতির কারণে বিদেশে বাংলাদেশের---------- নষ্ট হচ্ছে।

৪। ---------- কোন কিছু করাকেই দুর্নীতি বলে।

৫। প্রশাসনিক ---------- না থাকলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। দুর্নীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসহ দুর্নীতি দমনের উপায় বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। অপরাধ, ২। সামাজিক, ৩। ভাবমূর্তি, ৪। নীতিবর্জিত, ৫। জবাবদিহিতা

পাঠ-৬ : বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- কিশোর অপরাধ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

কিশোর অপরাধ

আধুনিক সমাজব্যবস্থার একটি ভয়াবহ সমস্যা হলো কিশোর অপরাধ। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফল হচ্ছে কিশোর অপরাধ, যার বিস্তার শুরু হয় শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে পারিবারিক কাঠামোর ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যা কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ব্যাপকহারে গ্রামীণ জনপদ হতে শহরের দিকে শিশু-কিশোরদের স্থানান্তর এবং বস্তিতে বসবাসের প্রভাবে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ কিশোর অপরাধ প্রবণতার উর্বরক্ষেত্র। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের বহুমুখী সামাজিক সমস্যাগুলোর তালিকায় কিশোর অপরাধ হচ্ছে অন্যতম। প্রতিটি শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের একটি বড় সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক চাপে সে সম্ভাবনা অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, কিশোর অপরাধ প্রবণতা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। আধুনিক শিল্প সমাজের উপজাত হলো কিশোর অপরাধ।

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা

কিশোর অপরাধের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ বেশ কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংগঠিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম পদ্ধতির বরখেলাপমূলক কাজই কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ ধারণাটি একটি জটিল বিষয়। এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী তাদের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। নিচে তাদের প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো–

অপরাধ বিজ্ঞানী Bisller-এর মতে, 'কিশোর অপরাধ হলো প্রচলিত সমাজিক নিয়মকানুনের ওপর অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।'

A. V. John-এর মতে, 'কিশোর অপরাধী হলো নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে দেশে প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী, যার চরিত্র সংশোধনের কিংবা পুনর্বাসনের জন্য কোনো বিশেষ কর্তৃপক্ষ বা বিচারকের সামনে হাজির করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী BURT-এর মতে, 'কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী বলে মনে করতে হবে, যখন তার অপরাধ বা অসামাজিক কাজের প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan ও Ferdinand-এর মতে, 'Juvenile delinquency consists of misbehavior by children and adolescents that leads to referral to the juvenile court.' অপরাধ বিজ্ঞানী Shulman অপ্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ওপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীনতাকে কিশোর অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ হলো বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক বা সমাজবিরোধী আচরণ, যা আইন কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার নিচের কিশোর-কিশোরী দ্বারা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে কিশোর অপরাধের পরবর্তী পৃষ্ঠার বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান হয়–

– কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ।

– পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে তাল মেলাতে না পেরে সমাজবিরোধী কাজে অংশগ্রহণ ।

– সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণে লিপ্ত হওয়া ।

বস্তুত কিশোর কর্তৃক অপরাধ আইন বিরোধী সব ধরনের অসামাজিক আচরণই কিশোর অপরাধ । যথাসময়ে তা সংশোধন করা না হলে, বয়ঃপ্রাপ্তির পর তা ক্রমাগত অপরাধ প্রবণতায় রূপ নিতে পারে ।

কিশোর অপরাধের প্রকৃতি

কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রে পরিপূর্ণ । কিশোর-কিশোরীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা অতি সহজে এবং স্বল্প সময়ে প্রভাবিত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কৌতূহলবশত অথবা নিজেকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য অপরাধ করে থাকে । আবেগের বশবর্তী হয়ে অপ্রাপ্তবয়স্করা চিন্তাভাবনা না করে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, বস্তি, শিশুশ্রম প্রভৃতি বৈচিত্রময় সামাজিক সমস্যাগুলোতে কিশোর অপরাধ অপেক্ষাকৃত একটি নবতর সংযোজন । তবে নবতর সংযোজন হলেও এ সমস্যাটি ক্রমব্যাপ্তিশীল । যদিও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহর এলাকাতেই সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গভীরতা তথা প্রকোপ বেশি । সামগ্রিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের কিশোর অপরাধীদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । এগুলো হলো–

- শহর এলাকার কিশোর অপরাধী;
- গ্রাম এলাকার কিশোর অপরাধী;
- উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী;
- নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী ।

উল্লিখিত চার শ্রেণীর কিশোর অপরাধীদের মাঝে যেসব অপরাধ প্রবণতা দেখা যায় তা মূলত সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড । তবে, সাধারণত যেসব কিশোর অপরাধ সচরাচর দেখা যায় তা নিম্নরূপ :

- পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবাধ্যতা ও তাদের অনুমতি ছাড়া গৃহত্যাগ ।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা ।
- স্কুলগামী মেয়েদের উত্যক্ত করা ।
- রাস্তায় বা লোকালয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করা ।
- বাস বা ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ ।
- রাস্তাঘাটে মারপিট, ছিনতাই, হয়রানি করা ।
- স্কুল পালানো, পরীক্ষায় নকল করা ও বিনা কারণে হৈ-হুল্লা করা ।
- অসঙ্গত দৈহিক সম্পর্ক ।
- খেলার মাঠে মারামারি, অসামাজিক কথাবার্তা ইত্যাদি ।

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধের স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমন বহুমুখী ও বিচিত্র, তেমনি কিশোর অপরাধ সংশ্লিষ্ট কারণ ও উপাদানসমূহও বহুমুখী । অর্থাৎ অপরাধের ধরনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ বা উপাদানের প্রভাব রয়েছে । সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধ বিজ্ঞানীগণ তাই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কিশোর অপরাধের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ।

Bertrand Russell (বারট্র্যান্ড রাসেল)-এর মতে, 'বেশিরভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন নিপীড়ন থেকে, এর ফলে পরবর্তীতে সে কিশোর অপরাধী হয় ।'

Karl Marx এর মতে, 'কিশোর অপরাধসহ সকল অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রভাব ।'

Dr. Paul Chowduhry-তার 'A Handbook of Social Welfare' গ্রন্থে কিশোর অপরাধের বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কারণের কথা উল্লেখ করেছেন –

১. ভগ্ন পরিবার – যেখানে আবেগ, ভালোবাসা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।

২. যথাযথ চিত্তবিনোদনের অভাব।

৩. চরম দারিদ্র্য ও পিতামাতার অবহেলা।

৪. শিশুশ্রম ও শিশুকে জোরপূর্বক কাজে নিয়োগ দান।

৫. কর্মজীবী মা, বাসায় শিশুযত্নের অভাব।

৬. স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবাঞ্ছিত সঙ্গী।

৭. সিনেমা, অনাকাঙ্ক্ষিত সাহিত্য।

৮. বংশগত ও জৈবিক উপাদান।

সমাজবিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার অপরাধের মূল কারণ দারিদ্র্য আর শহর এলাকার অপরাধের কারণ কলাকৌশলগত আধুনিকতা। নিম্নে সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধের সাধারণ কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

১। **বংশগত কারণ :** বংশগত কারণ সাধারণ অপরাধের পাশাপাশি কিশোর অপরাধেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো পরিবারের পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ই যদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে তবে ঐ পরিবারের কিশোর সন্তানদের মাঝেও এক ধরনের অপরাধ প্রবণতা গড়ে ওঠে।

২। **জৈবিক কারণ :** ত্রুটিপূর্ণ দৈহিক আকার ও গঠন, শৈশবে স্নায়ুতন্ত্রের অসামঞ্জস্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলো শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ তৈরি করে। সমবয়সী সঙ্গীদের অপেক্ষা কোনো কিশোর যদি অধিক লম্বা বা খাঁটো কিংবা অন্য কোনো শারীরিক খুঁত সম্পন্ন হয় তবে তার মাঝে এক ধরনের হীনমন্যতা দেখা দিতে পারে, যা থেকে অপরাধমূলক আচরণ সৃষ্টি হয়।

৩। **ভৌগোলিক কারণ** : বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও ঋতুচক্রের সাথে অপরাধ প্রবণতার বেশ গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। শহরের ঘনবসতি এলাকায় শিশু-কিশোররা অপরাধ করে সহজেই পালিয়ে যেতে পারে। আবার পাহাড়ি এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি কম থাকে বলে অপরাধ প্রবণতা বেশি।

৪। **অর্থনৈতিক কারণ** : দারিদ্র্য, আর্থিক অসচ্ছলতা বা সম্পদের অপ্রতুলতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রায় সকল সামাজিক সমস্যার সাথেই গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যা থেকে কিশোর অপরাধও ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ অথবা পারিবারিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি বর্তমানে কিশোর বয়সীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নেশাদ্রব্যের জন্য অর্থের যোগাড় করতে ছিনতাই, চুরি, ঘরের জিনিস বিক্রয়, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় প্রভৃতি ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

৫। **পরিবেশের প্রভাব** : শিশু-কিশোররা যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশও অনেকক্ষেত্রে তাদের অপরাধী হয়ে ওঠার পিছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খারাপ পরিবেশের প্রভাবে শিশু-কিশোররা অসামাজিক, অবৈধ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এক সময় নিজেরাই অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

৬। **পারিবারিক পরিবেশ** : সাধারণত দেখা যায় যেসব পরিবারের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে না সেসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার হার স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় আছে এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশি। এক্ষেত্রে পিতামাতার দাম্পত্ত কলহ,

বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানদের অতিরিক্ত শাসন অথবা স্বাধীনতা, সন্তানদের প্রতি অসম দৃষ্টিভঙ্গি, চিত্তবিনোদনের অভাব প্রভৃতি কারণেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে ।

৭। **মনস্তাত্ত্বিক কারণ :** Bowely তার The Nature of Development of the Children' গ্রন্থে বলেছেন 'শিশুমনে মৌলিক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলো যখন সহজে পরিতৃপ্তির পথ পায় না, তখন অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে ।' মূলত পিতা-মাতা কর্তৃক স্নেহ, ভালোবাসার অভাব, অতিরিক্ত শাসন, নির্যাতন, অতিরিক্ত আদায়, নিরাপত্তাবোধের অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো এবং এরই সাথে সাথে মানসিক হতাশা, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, হীনমন্যতা, নিরাশা, ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভৃতি বিষয়গুলো কিশোরদের অপরাধ প্রবণ করে তোলে ।

৮। **রাজনৈতিক কারণ :** বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমবর্ধনশীল কিশোর অপরাধ সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান । রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারে শিশু-কিশোর অপরাধের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে ।

৯। **প্রশাসনিক কারণ :** কিশোর অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, সংশোধন ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা, বয়স্ক অপরাধীদের সাথে একসাথে কারাবাস প্রভৃতি কারণে কিশোর অপরাধীরা আরও বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে ।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও আরো যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে –

- সামাজিক বন্ধন লোপ ।
- সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাব ।
- সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব ।
- সামাজিক অনাচার ।
- দুর্নীতি ।
- অনুকরণপ্রিয়তা ।
- অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ।
- শিল্পায়ন ও নগরায়ন ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব ।
- ধনী-দরিদ্রের অসম জীবনযাপন ।
- সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব ।
- আইনের অপপ্রয়োগ ।

সারসংক্ষেপ

আধুনিকতার নেতিবাচক ফল হচ্ছে কিশোর অপরাধ । কিশোর অপরাধ প্রবণতা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রতিবন্ধক । পারিবারিক কলহ, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্য, সঙ্গদোষ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, যথাযথ চিত্তবিনোদনের অভাব, শিশুশ্রম প্রভৃতি কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। কিশোর অপরাধ আধুনিকতার —— ফল।

২। কিশোরদের সামাজিক —— পরিপন্থী কাজ হলো কিশোর অপরাধ।

৩। —— বসবাসের প্রভাব কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। শিল্পায়ন ও —— কিশোর অপরাধের দুটি বড় কারণ।

৫। গ্রামীণ এলাকার অপরাধের মূল কারণ ——।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণগুলো লিখুন।

২। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। নেতিবাচক, ২। শৃঙ্খলা, ৩। বস্তিতে, ৪। নগরায়ন, ৫। দারিদ্র্য।

পাঠ-৭ : কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বর্তমানে কিশোর অপরাধ শুধু সনাতনী অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বহু নতুন ধরনের কর্মে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। সমাজবিরোধী কাজের সাথে কিশোর অপরাধের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, এ সমস্যার জন্য কিশোররা নিজেরা দায়ী নয়। এজন্য দায়ী পরিবর্তিত সামজিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। এর ফলে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু এখনই এ অপরাধ মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে অচিরেই তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে–

কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়

১. পারিবারিক পরিবেশকে শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

২. পিতা-মাতাকে শিশু-কিশোরদের মৌলিক চাহিদার প্রতি নজর দিতে হবে।

৩. দেশের সকল অশ্লীল বই, ছায়াছবি, ডিস এন্টিনা ও ভিসিআর-এ ছবি প্রদর্শন কঠোর আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. শিশুদের নির্মল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সঙ্গদোষে যাতে শিশুরা খারাপ হতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. বিদ্যালয়গুলোতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. দরিদ্র কিশোরদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৮. কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের আদর্শ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. শিশু শ্রমের ব্যবহার ও বিক্রি বন্ধ করতে হবে, সে স্থলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. জনবসতি যেন নোংরা ও ঘনবসতিতে পূর্ণ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনা ভিত্তিক আবাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১১. শিশুরা যাতে নিত্য নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই দিকে অভিভাবকদের মনোযোগী হতে হবে। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে কিশোররা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১২. অপরাধীদের বিচারের জন্য যে শাস্তিমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, প্রয়োজনিয় তার পরিবর্তন এনে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

১৩. অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা এবং বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারে যাতে কেউ দীর্ঘদিন জেলখানায় না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৪. পরিত্যক্ত, অবহেলিত শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম

১৯৪৯ সালে ঢাকার অদূরে মুড়াপাড়া নামক স্থানে একটি ÔBrostal School' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোর ওপর নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। **কিশোর আদালত :** ১৯৭৪ সালে শিশু আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আদালতই কিশোর আদালত। এ আদালত কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত এক বিশেষ আদালত যেটি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। এ আদালতে ঘরোয়া পরিবেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের চেষ্টা করা হয়।

২। **কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান :** দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আচরণ সংশোধন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের অধীনে টঙ্গীতে 'কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান' স্থাপিত হয় এবং ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি কিশোর বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে- গাজীপুর, টঙ্গী ও যশোরে। শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

৩। **কিশোর হাজত :** অপরাধের প্রকৃত কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচারকালীন সময়ে কিংবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে যে আলাদা ব্যবস্থায় রাখা হয় সেটিই হলো কিশোর হাজত।

৪। **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :** অপরাধী কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ শিক্ষার আওতায় এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী কিশোরদের শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা ও তাদের মননশীলতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে তারা ভবিষ্যতে সমাজে পুনর্বাসিত ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে– দর্জি বিদ্যা, কার্পেন্টারি, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইল প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। **প্রবেশন :** প্রবেশন কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা মূলত এক পরীক্ষাকাল। আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত শাস্তি বা দণ্ড স্থগিত রেখে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাসের সুযোগ প্রদানে এক বিশেষ ব্যবস্থাই হলো প্রবেশন।

প্রকৃতপক্ষে, অপরাধীর একান্ত আপনজন হয়ে তথা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয় ও সে অনুযায়ী সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধীকে প্রথম বারের মতো আত্মশুদ্ধির একটা সুযোগ প্রদান করাই প্রবেশনের মূল লক্ষ্য।

৭। **প্যারোল :** প্রবেশনের ন্যায় প্যারোলও অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের এক নিরীক্ষা কাল। তবে প্রবেশনে যেখানে শাস্তি বা দণ্ড স্থগিত রেখে এ নিরীক্ষা পর্যায়ে আনা হয়, সেক্ষেত্রে প্যারোলের বেলায় কিছুদিন শাস্তি ভোগ করার পর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপরাধীকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে আর অপরাধ করবে না, বিনা অনুমতিতে বাসস্থান পরিবর্তন করবে না, প্যারোল অফিসারের নিকট নিয়মিত দেখা করবে এরূপ শর্তে অপরাধীকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা হয়।

সারসংক্ষেপ

কিশোর অপরাত্বের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে কিশোর অপরাধীদের সমাজের মূল স্রোতে মিশতে দিতে হবে। কিশোর অপরাধ প্রবণতা রোধের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন কোন সমাধান নয়। তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, ভালবাসা-আদর-মমতা দিয়ে লালন-পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে কিশোরদের জন্য সুষ্ঠু মনোরম চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(খ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলা দেশে কয়টি কিশোর বিকাশকেন্দ্র রয়েছে

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি।

২। শিশু আইন প্রণয়ন করা হয় –

(ক) ১৯৭৪ সালে (খ) ১৯৮৪ সালে (গ) ১৯৯৪ সালে (ঘ) ১৯৭৮ সালে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশ কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। খ, ২। ক